Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 56
October–December, 2018

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির শরয়ী বিধান : একটি পর্যালোচনা

Shariah Injunction Regarding Appointment of Women as Judges: A Critical Analysis

Abdus Sattar Aini*

ABSTRACT

This article has endeavored to explicate the diverse juristic stances regarding the appointment of women as judges. Considering the underlying arguments behind the variegated juristic thoughts the author of the paper asserted that four different juristic opinions exist regarding the appointment of women to the office of judge namely 1) Appointment of women to the office of judge is haram (forbidden) 2) Women can be appointed as judges if and only if necessity exists, 3) Women can adjudge those cases where they are entitled to testify and 4) Appointment of women as judges is permissible. The critical scholarship developed by the author evidently argues that advancement of any proscription regarding the appointment of women as judges on the basis of texts of the Qur'an and Hadith is controversial, which has possibility to different interpretation. Moreover, the presence of ijma (scholarly consensus) on this issue is not proven accordingly. Furthermore, drawing comparison between the appointment of president and judge is erroneous. Last but not least the juristic thought prohibiting women's appointment to the office of judge is explicitly vitiated by customary influence.

Keywords: law and justice, trial, justice, women's rights, women judge.

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধে ইসলামের প্রাথমিক কালপর্বে বিচারের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ধারণার চিত্র অঙ্কন এবং যেসব দলীলের ওপর ভিত্তি করে—এ-বিষয়ে বিভিন্ন ফিকহী মাযহাব গড়ে

* Abdus Sattar Aini, Master of Social Sciences from the Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka, email: abdussattaraini@gmail.com

উঠেছে সেগুলোর উদ্দেশ্যগত ও নীতিগত দিক পর্যালোচনা করে বিচারক পদে নারী নিযুক্তির শরয়ী হুকুমের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি প্রসঙ্গে চারটি ফিকহী মত প্রচলিত : ১. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি হারাম, ২. প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা বৈধ, ৩. যেসব বিষয়ে নারীরা সাক্ষ্য দিতে পারে সেগুলোতে বিচারও করতে পারে, ৪. তা জায়েয। শরয়ী দলীলসমূহ বিচার-বিশ্লেষণের পর জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বক্তব্যগুলো দ্ব্যর্থহীন নয়; বরং তা নানা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। এ ক্ষেত্রে যে ইজমার দাবি করা হয় তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। একইভাবে বিচারককে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে তুলনা করাও শুদ্ধ নয়। তাছাড়া বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম বলার ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রভাবও রয়েছে।

মূলশব্দ: আইন ও বিচার, বিচারকার্য, ন্যায়বিচার, নারী অধিকার, নারী বিচারক।

ভূমিকা

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির শরয়ী হুকুম-সম্পর্কিত আলোচনা একটি আবদ্ধ বলয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। এসব আলোচনা যে-উপসংহার ও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা কখনো আপত্তিমুক্ত ছিলো না। ধারণাগত ও পরিভাষাগত আপত্তি যেমন ছিলো, তেমনি সংশ্লিষ্ট নুসূসের উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি নিয়ে এবং এ-হুকুমের ওপর কালগত ও প্রথার প্রভাব সম্পর্কেও আপত্তি ছিলো। এ-হুকুমের ওপর স্থানগত ও পরিস্থিতির প্রভাবও ছিলো, ঐতিহাসিক ঘটনাবলিরও প্রভাব ছিলো। ফলে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়নি।

উপর্যুক্ত মাত্রাগুলোর গভীরতা বিচার করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নারীর নিযুক্তি-সংশ্লিষ্ট আহকামের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনো আলোচনা সম্পন্ন হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানগত আলোচনা পূর্ণতা পায়নি। সব আলোচনাই চার মাযহাবের ইমামগণ 'কী' বলেছেন তাতে সীমাবদ্ধ থেকেছে; 'কেনো' তাঁরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ফলে কোনো আলোচনাই চূড়ান্ত বলার অবকাশ নেই।

এ প্রবন্ধে ইতিহাস, ফিক্‌হ ও উসুলে ফিকহের গ্রন্থাবলি থেকে আহরিত তথ্যরাশি বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনাটি চারটি মৌলিক অংশে বিভক্ত:

১. বিচারের ধারণা;
২. শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা;
৩. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি সম্পর্কে ফিকহী মতামত;
৪. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত ও তার যৌক্তিকতা।

বিচারের ধারণা

১. বিচারের তাত্ত্বিক ধারণা

শাব্দিক অর্থ : 'আল-কাযা' বা বিচারের কয়েকটি শাব্দিক অর্থ রয়েছে। যেমন : রায় বা নির্দেশ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে (Al-Qurān: 17:23)।

'আল-কাযা'র আরেক অর্থ কোনো কাজ থেকে অবসর নেওয়া। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾

অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন (Al-Qurān: 41:12)।

'আল-কাযা' আদায় করা, সমাপ্ত করা, প্রস্তুত করা, নির্ধারণ করা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (Al-Jawharī 1982, 6/2463, 2464)।

পারিভাষিক অর্থ : চার মাযহাবের মতানুসারে 'আল-কাযা' বা বিচারের ধারণা বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়।

হানাফী মাযহাবে বিচারের বিভিন্ন ধারণা পাওয়া যায়। যেমন : ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, অধিকার সাব্যস্ত করা, রায় দেওয়া, মানুষের মধ্যে ফয়সালা করা। ইমাম আস-সারাখসী রহ. (১০৯০ খ্রি.)-এর মতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই বিচারের মৌলিক উদ্দেশ্য। তিনি বলেন:

لأن القضاء بالحق إظهار العدل، وبالعدل قامت السموات والأرض، ورفع الظلم.

ন্যায্য বিচারের দ্বারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইনসাফের দ্বারাই আকাশমণ্ডলী ও জমিন স্থির রয়েছে এবং জুলুম তিরোহিত হয়েছে (Al-Sarakhsī 1986, v8, 16/60)।

আল-কাসানী রহ. (১১৯১খ্রি.) রায় ও হুকুমের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন:

والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عز وجل.

কাযা বা বিচার হলো মানুষ্যের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করা এবং আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা রায় দেওয়া (Al-Kāsānī 2000, 9/3)।

আয-যাইলায়ী রহ. হকদারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন:

ولنا أن المقصود إيصال الحق إلى المستحق.

আমাদের মতে বিচারের উদ্দেশ্য হলো হকদারের কাছে তার হক পৌঁছে দেওয়া (Al-Zaila'ī 2000, 5/82)।

মালিকী মাযহাব অনুসারে 'আল-কাযা'র অর্থ হলো শরয়ী নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া এবং তা পালনে বাধ্য করা। ইবনে আরাফাহ রহ. (১৩১৬-১৪০০খ্রি.) বলেন:

القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي، ولو بتعديل أو تجريح.

আল-কাযা : একটি বিচারিক বৈশিষ্ট্য, যা বৈশিষ্ট্যধারীর (বিচারকের) জন্য তার শরয়ী নির্দেশ বাস্তবায়ন আবশ্যক করে, এমনকি সংশোধন ও বলপ্রয়োগ করে হলেও (Al-Khurashī 1997, 7/473)।

মালিকী ফকীহ ইল্লিশ (১৮০২-১৮৮২খ্রি.) বলেন—

القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.

বাধ্যতামূলককরণের ভিত্তিতে শরয়ী নির্দেশ অবহিত করা ('Illlish 2003, 7/168)।

শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে আল-কাযা'র অর্থ হলো কর্তৃত্ব, নির্দেশ, রায় ও বাধ্যতামূলককরণ। আল-হাইতামী রহ. (৯০৯-৯৭৩হি.) বলেন:

وشرعاً الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع.

আল-কাযা'র পারিভাষিক অর্থ হলো- এর (বিচারের) পর আসন্ন কর্তৃত্ব বা উদ্ভূত রায় অথবা শরীয়তের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলককরণ (Al-Haithamī 2001, 4/342)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বিচারের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও হকদারদের হক প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় এনেছেন। তাঁর মতে, মানুষের জন্য অবশ্যই বিচারকের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় মানুষের অধিকার বিনষ্ট হবে (Al-Maqdisī 1990, 524)। অন্যরা বাধ্যকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। আল-মিরদাভী রহ. (৮১৭-৮৮৫হি.) বলেন, শরীয়তে বিচারের উদ্দেশ্য হলো, কোনো রায়কে বাধ্যতামূলককরণ (Al-Mirdābī 1997, 11/147)। আবার আল-বাহুতী রহ. (১৫৯২-১৬৪১খ্রি.)-এর মতে, বিচারকের দায়িত্ব হলো, শরয়ী হুকুম বিশ্লেষণ করা, তা বাধ্যতামূলক এবং বাদী-বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করা (Al-Bahūtī 2003, 2/446)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, চার মাযহাবের ইমামগণই বিচারের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি বিষয়কে বিবেচনায় এনেছেন, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা। কারণ, কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। বিচারিক নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলককরণের সক্ষমতাও জরুরি। তাহির ইবনে আশুর (১৮৭৯-১৯৭৩খ্রি.) এ-দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, বিচারককে এমন সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে হবে, যা তাকে অন্যের অধীন করে। অবশ্য অধীনতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে (Al-Mīsābī 1998, 369)। লক্ষণীয় যে, হানাফী মাযহাবের অভিমত অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিশেষ করে ইমাম সারাখসী ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে বিচারকার্যের

উদ্দেশ্য বলেছেন। ন্যায়বিচারের দ্বারাই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনসাফের ফলেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী টিকে আছে। বিচারব্যবস্থার তাত্ত্বিক আলোচনায় ইনসাফ কথাটি সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে। ইনসাফই হলো বিচারের কার্যকারণ। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে বিচারব্যবস্থার কোনো গুরুত্ব থাকে না। হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ শরয়ী হুকুম বর্ণনার যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা জ্ঞান ও ইজতিহাদের ইঙ্গিত বহন করে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের দ্বারাই ইনসাফের পূর্ণতা ঘটে। ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮খ্রি.) এ-কথাই বলেছেন, জ্ঞান ছাড়া কোনটা ইনসাফ আর কোনটা জুলুম তা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং দীনের পূর্ণাঙ্গতা বলতে জ্ঞান ও ইনসাফকেই বোঝায় (Ibn Taymiyyah 2004, 15)।

মোটকথা, আল-কাযা বা বিচারের তাত্ত্বিক ধারণা তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে : ১. শরয়ী জ্ঞান, ২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরি সাধারণ জ্ঞান (শরয়ী জ্ঞান বাদে অন্যান্য জ্ঞান) এবং ৩. কর্তৃত্ব ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (Hilāl 2011, 89-92)।

কাযী বা হাকিম হলেন স্বাধীন বিচারক, যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন:

> نص أصحاب مالك - رضي الله تعالى عنه - على أن القاضي لا بد أن يكون حرا وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية.
>
> ইমাম মালিক ইবনে আনাস রা.-এর শিষ্যগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বিচারককে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। সেনাপতি ও যুদ্ধপতিও বিচারকের অনুরূপ। কারণ, এগুলো হলো দীনী (শরয়ী) পদ, এগুলোর সঙ্গে শরয়ী হুকুম বাস্তবায়নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট (‘Illish 2003, 7/170)।

একই সঙ্গে বিচারককে বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানী হতে হবে, যিনি ইনসাফ ও অধিকারের বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করেছেন। ইবনে আশুর রহ. বিচারকের জন্য যেসব বিষয়ের শর্তারোপ করেছেন তা থেকে এটা বোধগম্য হয়। তিনি বলেন:

> وقد ظهر أن مقصد الشريعة من القاضي إبلاغُهُ الحقوق إلى طالبيها. وذلك يعتمد أموراً: أصالة الرأي، والعلم، والسلامة من نفوذ غيره عليه، والعدالة.
>
> বিচারক নিয়োগ দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো প্রার্থীদের কাছে তাদের হক পৌঁছে দেয়া। তা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : ১. রায়ের বিশুদ্ধতা, ২. জ্ঞান, ৩. তার ওপর কারো কর্তৃত্ব না থাকা, ৪. ন্যায়পরায়ণতা (Al-Mīsābī 1998, 366)।”

২. নববী যুগ ও পরবর্তী ইসলামী যুগের প্রেক্ষিতে বিচারের প্রায়োগিক ধারণা

মদীনায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রাসূলুল্লাহ স. নিজেই বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি পালন করেছেন:

> ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾
>
> সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর এবং যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না (Al-Qurān: 5:48)।
>
> ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾
>
> আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করো এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে তর্ক করো না (Al-Qurān: 4:105)।

রাসূলুল্লাহ স.-ই সব ধরনের বিচার-মীমাংসা করতেন। মদিনার অধিবাসীদের সব গোত্রের মধ্যে লিখিত চুক্তিমূলক দলীল থেকে এ-কথা স্পষ্টভাবে জানা যায়। ‘এই চুক্তিতে সম্মতি প্রদানকারী গোত্রগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে বা কোনো বিবাদ দেখা দিলে, যার থেকে ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ তাআলার (নির্দেশনার) কাছে ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স.-এর কাছে পেশ করা হবে (Ibn Hishām 1998, 2/94-98)।’ রাসূলুল্লাহর হাতে শরয়ী, বিচারিক ও নির্বাহী কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো। কারণ, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হতো। সুতরাং শরয়ী কর্তৃত্বের দিক থেকে তিনি ভ্রান্তির শিকার হতে পারেন না। তাছাড়া বিচারিক ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিলো এ-কারণে যে, তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ইজতিহাদের (বিবেচনা-বিশ্লেষণ) নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار.
>
> আমিও তো একজন মানুষ। তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ (-এর মামলা-মোকাদ্দমা) নিয়ে আমার কাছে আস। তোমাদের কেউ কেউ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের (প্রতিপক্ষের) চেয়ে বেশি বাকপটু। সুতরাং আমি ঘটনা উপস্থাপনের সময় যা শুনি সেই অনুযায়ী ফয়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (যুক্তি-তর্কের প্রেক্ষিতে) বিচার করে তার ভাইয়ের হক তাকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, এ অবস্থায় আমি তাকে কেবল একখণ্ড আগুনই দিলাম (Muslim 2003, 1713)।

তাঁর বিচারের রায় বাস্তবসম্মত হলে সেটাই কার্যকর হতো; বাস্তবতা পরিপন্থী হলে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুদ্ধ করে দেওয়া হতো। আল-আমিদী (১১৫৬-১২৩৩ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন, শা‘বী বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به فيترك ما قضى به على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن.

এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ স. বিচার-মীমাংসা করতেন, তারপর তিনি যে মীমাংসা দিয়েছেন তার বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করে কুরআন নাযিল হতো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যে-মীমাংসা দিয়েছিলেন তা মুলতবি করতেন এবং কুরআন যে-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তা গ্রহণ করতেন (Al-Āmidī, 3/141)।

এক্ষেত্রে উরায়নার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ স.-এর বিচার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এলো এবং জানালো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর তারা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাদের দেহ হলুদ বর্ণ ধারণ করলো। রাসূলুল্লাহ স. কয়েকজন রাখাল দিয়ে তাদের মদিনার বাইরে সদকার উটের কাছে পাঠালেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করে। তারা সুস্থ হয়ে ওঠার পর রাসূলের রাখালদের হত্যা করলো। উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ স. তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলার ও চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এভাবে তারা মারা গেলো। তারপর আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা তাদের শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে[১] তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (Al-Qurān: 5:33)।

ডাকাতি ও রাহাজানির ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান কী, তা এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে। ইমাম রাযি রহ. (১১৪৯-১২১০খ্রি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ স. যা করেছিলেন তা রহিত করার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে। সুতরাং কুরআনের এই আয়াত দ্বারা রাসূলের ওই সুন্নাহ রহিত হয়ে গেছে (Al-Rāzī 1981, 11/220)।

আল্লাহ তাআলা আইন ও হুকুম বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব রাসূলুল্লাহ স.-এর হাতে রেখেছেন সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

[১]. 'বিপরীত দিক থেকে' অর্থ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা কর্তন করা হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা কোনো মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (Al-Qurān: 33:36)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয় (Al-Qurān: 4:65)।

এই আয়াতের নির্দেশের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা বিচারকার্যকে খলীফার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলীফা) বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসের ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে আছে (Al-Qurān: 38:26)।

ইসলামী রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলে রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন দেশে প্রশাসক পাঠালেন। তাঁদেরকে বিচারকার্যেরও দায়িত্ব দিলেন। মুআয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন এবং ওখানকার বিচারের দায়িত্ব দিলেন। আলী রা.-ও ইয়ামানে বিচারকার্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বিচারপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

أقض بينكم فإن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم.

"আমি তোমাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবো। তোমরা যদি তাতে সন্তুষ্ট হও তাহলে তা ফয়সালা হিসেবে কার্যকর হবে, অন্যথায় তা স্থগিত করে রাখবো। তোমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যাবে, তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।" কোন এক মামলায় আলী রা. বিচার করলেন। দেখা গেলো যে, তারা তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট নয়। ফলে হজ্জের সময়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং তাদের বিসম্বাদ

উত্থাপন করলো এবং আলী রা. কী বিচার-ফয়সালা করেছেন সেটাও জানালো। রাসূলুল্লাহ স. আলীর বিচারিক সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে বললেন,

هو ما قضى بينكم.

সে তোমাদের মধ্যে যে-ফয়সালা দিয়েছে সেটাই কার্যকর হবে" (Ibn Qayyim 1986, 5/14)।

এসব রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, বিচার ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রশাসক বা গভর্নর বিচারিক কর্তৃত্ব ও বিচারের রায় বাস্তবায়ন এ দু ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী।

প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর শাসনকালে মদীনার বিচারকার্য পরিচালনা করতেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। ইবনুল আছীর রহ. (১১৬০-১২৩৩খ্রি.) আল-কামিল ফী আত-তারীখ-এ বলেছেন, আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আবু উবায়দা তাঁকে বললেন, আমি আপনার অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। উমর বললেন, আমি আপনার বিচারিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এক বছরের মধ্যে দুজন লোক (বাদী-বিবাদী) বিচারপ্রার্থী হলো না (Ibn al-Athīr 1997, 2/263)। মদীনার বাইরে আবু বকর রা.-এর প্রশাসনিক ও বিচারিক কর্তৃত্ব অটুট থাকলো। দেখা যাচ্ছে যে, তখনও বিচারিক কর্তৃত্ব ও বিচারের হুকুম বাস্তবায়নের প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে আলাদা করা হয়নি।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে ইসলামী রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলো। মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদ বৃদ্ধি পেলো। বিচার বিভাগকে আলাদা করে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিলো। উমর রা. কয়েকজনকে বিচারক ও প্রশাসক উভয় পদে নিযুক্ত করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বসরার প্রশাসক মুগিরা ইবনে শু'বা রা., শামের (সিরিয়ার) প্রশাসক মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা., ইয়ামেনের প্রশাসক আবু মুসা আল-আশআরি রা.। কয়েকজনকে কেবল বিচারক পদে নিযুক্ত করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুফার বিচারক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., কাদেসিয়াবাসীর বিচারক সুলাইমান ইবনে রবিয়া রা., মদিনার বিচারক আলী ইবনে আবু তালিব রা.। তবে বিচারিক কর্তৃত্ব তাঁর অনুগামী ছিলো; তিনিই ছিলেন প্রধান বিচারপতি। এভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থেকে আলাদা করে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। বিচারক পদে নিযুক্তির জন্য নীতিমালাও নির্ধারণ করেছিলেন, যার মূল ভিত্তি ছিলো বিচারকার্য-সম্পর্কিত জ্ঞান (Hasan 1979, 1/498)।

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর শাসনামলেও বিচারব্যবস্থা এরূপ ছিলো। তিনি শহর-নগরে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কর্মকর্তারা যেন হজ্জের মওসুমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের কারো অভিযোগ থাকলে তা পেশ করে। তিনি তাদের সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, তিনি শক্তিমানের বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষে রয়েছেন, যতক্ষণ সে জুলুমের শিকার

হয় (Ibn al-Athīr 1997, 2/546)। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব-ভার খলীফার ওপরই ন্যস্ত ছিলো।

চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবু তালিব রা. তাঁর পূর্বতন খলীফাগণের পরামর্শক ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁদের শাসনব্যবস্থায় তাঁর মতামত ও বিচার-বিবেচনা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। তাঁর শাসনামল সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তাঁর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে ইসলামী শাসন ও সাম্রাজ্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা এবং বিচারক পদে ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী লোকদের নিযুক্ত করা।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, বিচারিক কার্যক্রম খলীফার কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। খলীফাগণ সরাসরি বিচারব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে মতামত পেশ করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলেই আলাদা পদ সৃষ্টি করে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে। বিচারকদের সরাসরি খলীফা নিয়োগ দিয়েছেন। এ-সকল বিচারকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো, অটুট মর্যাদা ও বিচারিক স্বাধীনতা। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বিচারবিভাগ স্বাধীন ছিলো ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো। বিচারক পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় লক্ষ রাখা হতো : জ্ঞান, আল্লাহভীতি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা।

মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে বিচারকের কার্যাবলি রায় ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। রায় বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব ছিলো প্রশাসকদের। ফলে বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়। স্মর্তব্য যে, বিচারকদের স্বাধীনতা ছিলো অটুট, তাদের ওপর রাজনীতির কোনো দখল ছিলো না। রায় ও ফয়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এমনকি তাঁরা প্রশাসকদের বিরুদ্ধেও রায় দিতেন এবং তা কার্যকরও হতো (Hasan 1979, 1/500)।

বিচারব্যবস্থা নিয়ে তাঁরা গবেষণাও করতেন, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করতেন। ফিকহী হুকুম-আহকাম তখনও লিপিবদ্ধ হয়নি যে, তার ওপর খলীফাগণ নির্ভরশীল হবেন।

আব্বাসি শাসনামলেও খলীফার পক্ষ থেকে বিচারক নিযুক্ত করা হতো। যিনি বিচারক তিনি কেবল সাধারণ মানুষের বিচার করতেন না, আমীরুল মুমিনেরও বিচার করতেন। তবে খলীফা বিচারিক কর্তৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব উভয়টির তত্ত্বাবধান করতেন। তা সত্ত্বেও বিচারকগণ খলীফাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফ খলীফা হারুনুর রশিদকে পরামর্শ দিতেন। খলীফাদের চেষ্টা ছিলো বিচারবিভাগকে প্রভাবিত করার; কিন্তু বিচারকদের পক্ষ থেকে সায় না পাওয়ার ফলে তাঁরা এতে সক্ষম হননি। বিচারকগণ বরং নিজেদের অবস্থান ও স্বাধীনতা এবং

কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। হয়তো তাঁরা তাঁদের রায়ের ওপর অটল থাকতেন অথবা পদ থেকে ইস্তফা দিতেন। এই ক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আব্বাসি খলীফা মানসুরের শাসনামলে বিচারক সিওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ এক খণ্ড ভূমির ব্যাপারে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে সেনাপতির বিরুদ্ধে রায় দিলেন। অথচ তিনি মানসুরের পক্ষ থেকে ভূমিটি সেনাপতিকে প্রদানের নির্দেশ-সম্বলিত চিঠি পেয়েছিলেন। সিওয়ার খলীফার নির্দেশে বিচারের রায় পরিবর্তন করেননি। এতে মানসুর অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমার বিচারকেরা আমাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে এনেছেন (Al-Suyūṭī 2004, 199)।

অতএব, এ সময়কালের বিচারকার্যের বিবর্তন ও বিচারক পদে নিয়ুক্তি-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বিচারকের জন্য দুটি মৌলিক গুণ অপরিহার্য ছিলো, ১. ইনসাফ-সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার প্রায়োগিক দক্ষতা, এটি বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা; ২. শরয়ী হুকুম বাস্তবায়নের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা, এটি নির্বাহী ক্ষমতা। অতীতকালে একজন বিচারকের এই দুটি গুণ অবশ্যই থাকতো, এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব ছিলো না (Hilāl 2011, 93-95)। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতির ফলে বিচারকগণ ধীরে ধীরে হুকুম বাধ্যতামূলককরণ ও তা বাস্তবায়নে শক্তিমত্তা প্রয়োগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এখন তাঁদের দায়িত্ব ইনসাফপূর্ণ শরয়ী হুকুম জারি করা; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এখন বিচারকার্য ইনসাফ-সম্পর্কিত জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিমত্তার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য পূর্বে বিচার বলতে বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব, জ্ঞান ও ইনসাফ এ তিনটি বিষয়ের সমন্বিত রূপকে বুঝানো হলেও এখন জ্ঞান ও ইনসাফ বা ইনসাফ-সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝানো হয়।

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য

১. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও শরীয়ত প্রবর্তন

কুরআনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, নবী-রাসূল প্রেরণ ও আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো- পৃথিবীর বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো:
আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা করে (Al-Qurān: 57:25)।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং মানদণ্ড[২]। তুমি কি জান—সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন? (Al-Qurān: 42:17)

নিম্নবর্ণিত আয়াত চারটিতে রাসূলুল্লাহ স.-কে ও তাঁর পরবর্তী উম্মতকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন (Al-Qurān: 5:42)।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে (Al-Qurān: 5:8)।

﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾

আর আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে (Al-Qurān: 42:15)।

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন (Al-Qurān: 16:90)।

নিম্নবর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পয়গাম হলো ইনসাফ ও ন্যায়ের পয়গাম:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (Al-Qurān: 6:115)।

নিম্নবর্ণিত আয়াতে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী জাতির প্রশংসা করা হয়েছে:

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে (Al-Qurān: 7:181)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, শারে‘ বা শরীআত প্রবর্তক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে ইসনাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, প্রত্যেকের যথার্থ অধিকার বাস্তবায়ন করা। তাহির ইবনে আশুর বলেছেন, শরীয়তের বক্তব্যসমূহ ও কার্যাবলি পর্যালোচনার দ্বারা এটাই বোধগম্য হয় যে, উম্মাহর কতিপয় কর্তৃত্ববান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকবেন, যাঁরা কল্যাণ নিশ্চিত করবেন, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার

[২] মানদণ্ড হলো আদ্ল, ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও সুবিচার, যার নীতিমালা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা করবেন, উম্মতের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকাম কার্যকর করবেন। কারণ, শরীয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই হলো- সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং লোকদের কাছে তাদের ন্যায্য অধিকার পৌঁছে দেওয়া। অন্যথায় শরীয়তের বিধানাবলির উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে না। কারণ, মানুষ ক্রোধ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অন্যের অধিকার হরণ করে এবং অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি, অজ্ঞতা ও বিস্তৃতির ফলেও মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয় (Al-Mīsābī 1998, 363)। সুতরাং ইনসাফ ও সুবিচারের বিষয়টি আসমানি কিতাব নাযিল, নবী-রাসূল প্রেরণ ও মানুষের মধ্যে শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বরং এটাই মৌলিক উদ্দেশ্য, যেমন ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন,

﴿بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط﴾

আল্লাহ তাআলা নানা পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যে-হুকুম-আহকাম প্রবর্তন করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো তাঁর বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের সুবিচার নিশ্চিত করা (Ibn Qayyim 1991, 4/284)।

২. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের উপলক্ষ

কুরআনের বহু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাতির ধ্বংস ও বিনাশের প্রধান কারণ হলো- অবিচার ও জুলুম এবং তাদের বিজয়ের কারণ হলো ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾

ওইসব জনপদ—তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা জুলুম করেছিলো (Al-Qurān: 18:59)।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো জালিম (Al-Qurān: 21:11)।

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾

এই তো তাদের ঘরবাড়ি—সীমালঙ্ঘনের কারণে তা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে (Al-Qurān: 27:52)।

﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾

এবং আমি জনপদসমূহ তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা জুলুম করে (Al-Qurān: 28:59)।

এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট জাতিগুলো জুলুমের কারণে ধ্বংস হয়েছিলো। তারা সীমালঙ্ঘন করেছিলো, তাদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ ছিলো না; ফলে বিনাশই ছিলো তাদের অনিবার্য নিয়তি।

কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রের পতনের কারণ হলো জুলুম। ফেরাউনের রাজ্যও জুলুমের কারণেই ধ্বংস হয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾

ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মতো তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিলো জালিম (Al-Qurān: 8:54)।

তাদের জন্য আখেরাতেও রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আগুনের সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউন-সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে (Al-Qurān: 40:46)।

এসব উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও সুবিচারই হলো শাসনের ভিত্তি। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, এমনকি কাফের হলেও এবং জালিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না, এমনকি মুমিন হলেও।" (Ibn Taymiyyah 1995, 28/63) ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ঠিক না থাকলে শাসনও ঠিক থাকে না। গোটা রাষ্ট্র অন্যায়-জুলুমে সয়লাব হয়ে যায়।

৩. সর্বাবস্থায় ইনসাফই কাম্য

আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জুলুম দমনে নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমেই তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরাও (এই সাক্ষ্য দেন); আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān: 3:18)।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ বলেন:

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

হে আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও জুলুম হারাম সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করো না (Muslim 2003, 2577)।

জুলুম হলো অতিশয় নিকৃষ্ট ও জঘন্য ব্যাপার। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা খারাপ, সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও তা খারাপ। আল্লাহ তাআলা অনেক বিষয় মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজের জন্য বৈধ রেখেছেন। যেমন অহঙ্কার। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.

যার অন্তরে অণুমাত্র অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" (Muslim 2003, 147)। কিন্তু আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কারকে তাঁর ইযার ও চাদর বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে কুদসিতে রয়েছে:

العز إزاري، والكبر ردائي، فمن ينازعني واحدا منهما ألقيه في النار.

শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার এবং অহঙ্কার আমার চাদর; যে-কেউ এই দুটির কোনো একটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো (Muslim 2003, 2620)।

সুতরাং এ-কথাই স্পষ্ট হয় যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফ হলো ওয়াজিব, জুলুম সকলের জন্য হারাম। জুলুমের ক্ষেত্রে কখনোই কোনো ছাড় দেওয়া চলবে না।

আল্লাহ মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব ক্ষেত্রেই জুলুমকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো জুলুম থাকতে পারবে না। যেমন:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

স্মরণ করো, (সেই সময়ের কথা,) যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিলো, হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরিক করো না। নিশ্চয় শির্ক ভয়াবহ জুলুম (Al-Qurān: 31:13)।

মানুষের পরস্পরের মধ্যেও কোনো জুলুম থাকবে না:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয় (Al-Qurān: 4:135)।

নিজেদের বিপক্ষে গেলেও সত্য উচ্চারণ করতে হবে, জুলুমের পক্ষাবলম্বন করা যাবে না। মানুষের মামলা-মোকাদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে (Al-Qurān: 4:58)।

যাদের সঙ্গে বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তাদের সঙ্গেও সুবিচার ও ইনসাফ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর (Al-Qurān: 5:8)।

যার প্রতি অনুরাগ বা খাতির রয়েছে তার ক্ষেত্রেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা তার বিপক্ষে গেলেও। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾

তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না (Al-Qurān: 4:135)।

যাদের সঙ্গে আকীদাগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ রয়েছে তাদের সঙ্গেও ন্যায়বিচার করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

তুমি বলো, হে কিতাবীগণ! আসো সে কথায় যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে একই (Al-Qurān: 3:64)।

মুসলমানরা ইনসাফ ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের যাবতীয় কর্ম হবে ইনসাফভিত্তিক—ইসলামে এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া বলেন:

الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام.

এ-কথা বলা হয়ে থাকে যে, দুনিয়ায় ইনসাফের সাথে কুফরী শাসনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কিন্তু জুলুমের সাথে ইসলামী শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মহানবী স. বলেন:

ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي، وقطع الرحم.

সীমালঙ্ঘন (তথা জুলুম) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি সবচেয়ে দ্রুত হয় (Ibn Taymiyyah 2004, 155)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন:

فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شيء. إذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.

জুলুমকারী দুনিয়াতেই ধরাশায়ী হয় (তার শাস্তি পেয়ে যায়), যদিও আখেরাতে সে ক্ষমা ও আল্লাহর রহমত পেতে পারে। তার কারণ হলো, ইনসাফই সবকিছুর ভিত্তি। দুনিয়ার বিষয়গুলো যদি ইনসাফের সঙ্গে সম্পন্ন হয়, দুনিয়া টিকে যায়, যদিও তার (এমন শাসকের) জন্য আখেরাতে কোনো প্রাপ্তি নেই। অন্যদিকে দুনিয়ার কার্যাবলি

ইনসাফের সঙ্গে সম্পন্ন না হলে দুনিয়া টেকে না, যদিও তার (এমন শাসকের) ঈমান থাকার কারণে আখেরাতে প্রতিদান মিলবে (Ibn Taymiyyah 2004, 155)।

তার কারণ হলো, কুফরির শাস্তি বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার ব্যাপার। মৃত্যুর পর তাকে এই শাস্তি দেবেন। আর জুলুমের প্রাথমিক শাস্তি দুনিয়াতে পেতে হবে। কারণ জুলুম করে বান্দাদের হক ও অধিকার বিনষ্ট করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, কোনো ক্ষমা নেই।

৪. ইনসাফের প্রকারভেদ

১. প্রতিপালকের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: ঈমান, আবশ্যকীয় হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের সঙ্গে মানুষকে সৎপথে আহ্বান করা ইত্যাদি কার্যাবলির দ্বারা দীনের সুরক্ষা।

২. মানুষের নিজ সত্তার সঙ্গে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: খাদ্য ও বাসস্থান গ্রহণ, ক্ষতিকর ও চেতনা লোপকারী বিষয়-বস্তু থেকে দূরে থাকা এবং প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার সুরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৩. বিবাহ ও সন্তান প্রজননের মধ্য দিয়ে পরিবারের সঙ্গে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: পরিবার-পরিজনের প্রত্যেকের যথার্থ হক আদায় করা, তাদের ইজ্জত-আব্রুর সুরক্ষা।

৪. কর্মের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, লেনদেন ইত্যাদি ইনসাফের সঙ্গে সম্পাদন করা এবং সম্পদের সুরক্ষা প্রদান করা।

৫. শাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: ইনসাফপূর্ণ শাসন ও সুবিচারের মধ্য দিয়েই মানবজাতি, দীন ও সম্পদ টিকে থাকবে।

অর্থাৎ, মানুষের জীবন, বিবেকবুদ্ধি, সম্মান, সম্পদ ও দীন—এই পাঁচটি বিষয়ের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরি। একইভাবে মানুষ স্ত্রী-সন্তান-পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, কর্মক্ষেত্র, আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক—সব ক্ষেত্রেই ইনসাফের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করবে (Hilāl 2011, 95-100)।

বিচারক পদে নারীর নিয়ুক্তি সংক্রান্ত ফিকহী মতভেদ

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরামের মতামতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয নয়;
২. প্রয়োজনের ভিত্তিতে জায়েয আছে;
৩. যেসব ক্ষেত্রে নারী সাক্ষ্য দিতে পারে সে সব ক্ষেত্রে নারী বিচার করতে পারে;
৪. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয (Hilāl 2011, 101)।

প্রথম অভিমত : বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয নয়

অধিকাংশ ফকীহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ সাধারণভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা জায়েয আছে; বাকিরা না-জায়েয বলেছেন। ইবনুল কাসিম রহ. (১৩২-১৯১ হি.) ছাড়া মালিকী মাযহাবের অন্য ইমাম বলেছেন, বিচারক পদে নারীর নিয়োগ জায়েয নয়। ইমাম মালেক রহ. থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তা জায়েয ।

মালিকী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে দুসুকী রহ. (১৮১৫খ্রি.) তাঁর হাশিয়াতে বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির শুদ্ধতাকে বাতিল করে দিয়েছেন। নারীকে বিচারক পদে নিযুক্ত করা হলে তিনি কোনো রায় দিলে সেটা কার্যকর হবে না বলে তিনি মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নারী বা হিজড়া—কেউই বিচারক পদে আসীন হতে পারবে না।' সুতরাং তাদের বিচারক পদে নিযুক্ত করা শুদ্ধ হবে না এবং তাদের রায় কার্যকর হবে না। আল্লামা ইল্লিশ 'শার্হু মিনাহিল জালীল'-এ ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'বিচারক হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত। সুতরাং নারীকে বিচারক পদে নিযুক্ত করা যাবে না। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ওই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা তাদের কর্তৃত কোনো নারীর কাছে ন্যস্ত করেছে (Al-Bukhārī 2004, 4163; 'Illish 2003, 7/288)।'

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম গাযালী রহ. (১০৫৮-১১১১খ্রি.) রহ. বলেন, বিচারককে অবশ্যই স্বাধীন পুরুষ ও বিচক্ষণ মুফতী হতে হবে। দাস ও নারীর কোনো কর্তৃত্ব নেই (Al-Ghazālī 1997, 7/289)। আল-হাইতামি বলেন, পুরুষই বিচারক হতে পারবে। নারীর কোনো কর্তৃত্ব নেই, তা যেসব বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সেসব বিষয়ে হলেও। হিজড়াও বিচারক হওয়ার উপযুক্ত নয়। তার কারণ হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 'ওই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা তাদের ক্ষমতাকে কোনো নারীর কাছে ন্যস্ত করেছে।' এই হাদীসও সহীহ যে, هلك قوم ولوا أمرهم امرأة 'ওই সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে, যারা নারীর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়েছে (Al-Haithamī 2001, 4/344)। আল-আনসারী (মৃ. ৯৫৭হি.)ও অনুরূপ কথা বলেছেন, 'বিচারককে পুরুষ হতে হবে; কারণ, পুরুষের ওপর নারীর বিশেষ কর্তৃত্ব নেই, সুতরাং সে কীভাবে জনসাধারণের (পাবলিক) কর্তৃত্ব পেতে পারে, অথচ এতে বাইরে বেরুতে হবে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে? নবী কারীম স. বলেন, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 'ওই জাতি কখনো সফল হবে না যারা তাদের কর্তৃত্ব কোনো নারীর কাছে ন্যস্ত করেছে' (Al-Ansārī 2001, 8/265)। তা ছাড়া এ-ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ইজমাবিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ‘পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন’ (Al-Qurān: 4:34; Al-Māwardī 1996, 107)।

হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে আবু ইয়া‘লা (৯৯০-১০৬৬খ্রি.) বলেন, কর্তৃত্ব করার জন্য পুরুষ হওয়ার শর্ত এ-কারণে যে, নারীদের পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব নেই এবং সব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় (Abū Ya‘lā 1983, 60)।

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (১১৪৭-১২২৩খ্রি.) বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি শুদ্ধ না হওয়ার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করে বলেন, আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী— لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ওই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা কোনো নারীকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে।’ তাছাড়া বিচারককে বাদী-বিবাদীর মজলিসে উপস্থিত হতে হয়, পুরুষের মজলিসে যেতে হয়। আরো ব্যাপার হলো, নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তার সঙ্গে তার মতো হাজারো নারী যুক্ত হলেও, যদি না তাদের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকে। আল্লাহ তাআলা নারীদের ভ্রমপ্রমাদ ও বিস্মৃতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ‘স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে’ (Al-Qurān: 2:282)। সুতরাং নারী বড় ইমামত বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, কোনো দেশের শাসনক্ষমতাও পাবে না। এ-কারণেই নবী কারীম স., কোনো খলীফায়ে রাশেদ ও তাঁদের পরবর্তী খলীফাগণ কোনো নারীকে বিচারক পদে নিযুক্ত করেননি। যদি তা জায়েয হতো, তাহলে অবশ্যই কোনো নারী বিচারক থাকতো (Ibn Qudāmah 1992, 13/12)।

দ্বিতীয় অভিমত

পুরুষ বিচারক পাওয়া না গেলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে নারী বিচারক নিযুক্ত করা জায়েয। শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ সুলাইমান আল-আজিলী (মৃ. ১২০৪হি) বলেন, (বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পুরুষ না পাওয়ার ফলে উপর্যুক্ত) শর্ত ছুটে যাওয়ার কারণে ক্ষমতাবান শাসক যদি অনুপযুক্ত মুসলিমকে (যেমন পাপাচারী ও নারী) বিচারক পদে নিযুক্ত করে, তাহলে প্রয়োজনের কারণে তাদের রায় কার্যকর হবে, যাতে মানুষের কল্যাণ বিনষ্ট না হয় (Al-‘Ajilī 1996, 8/359)।

তৃতীয় অভিমত

যেসব বিষয়ে নারীরা সাক্ষ্য দিতে পারে, সেসব বিষয়ে তাদের বিচারক নিযুক্ত করা জায়েয। এটি হানাফী ইমামগণের অভিমত। নারীদের সাক্ষ্যদানের বিবেচনায় হুদূদ ও কিসাস বাদে বাকি সব বিষয়ে তাদের বিচারকার্য সমাধা করা জায়েয (Al-

Marghīnānī, 3/107)। কারণ, সাক্ষ্যদানের উপযুক্ততাই বিচারকার্যের উপযুক্ততার ভিত্তি। সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে কাউকে বিচারক নিযুক্ত করা যাবে না। বিচারের শরয়ী হুকুম সাক্ষ্যদানের শরয়ী হুকুমের অন্তর্গত। কারণ, প্রত্যেকটিই কর্তৃত্বের একটি পর্যায়। সুতরাং যার সাক্ষ্যদানের উপযুক্ততা রয়েছে তার বিচারক হওয়ারও উপযুক্ততা থাকবে। সাক্ষ্যদানের জন্য যা-কিছু শর্ত বিচারকার্যের জন্যও তাই শর্ত (Al-Marghīnānī, 3/101)।

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি সংক্রান্ত হানাফী মাযহাবের বক্তব্যসমূহ:

আল-কাসানী বলেন:

> وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة.
>
> সাধারণভাবে পুরুষ হওয়া বিচারক নিযুক্তির বৈধতার শর্ত নয়। কারণ, নারীরা সাধারণভাবে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত। তবে তারা হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে বিচার সমাধা করতে পারবে না; কারণ, এ দুটিতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে না। সাক্ষ্যদানের উপযুক্ততার সঙ্গে বিচারকার্যের উপযুক্ততা আবর্তিত হয় (Al-Kāsānī 2000, 9/86)।

কাজী আল-গাযনাবী (মৃ. ১১৯৭খ্রি.) কর্তৃক রচিত কিতাব الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي -এ রয়েছে:

> ويجوز قضاء المرأة بكل شيء إلا في الحدود والقصاص.
>
> হুদূদ ও কিসাস বাদে বাকি সব বিষয়ে নারীর বিচারকার্য জায়েয (Al-Gazhnawī 2011, 2/282)।

আবদুল গনী আল আল-মায়দানী আল-হানাফী (১৮০৭-১৮৮১খ্রি.) কর্তৃক রচিত কিতাব اللباب في شرح الكتاب-এ রয়েছে:

> ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها.
>
> নারীদের সাক্ষ্যদানের বিবেচনায় হুদূদ ও কিসাস ছাড়া বাকি সব বিষয়ে তাদের বিচারকার্য সমাধা করা জায়েয (Al-Maydānī, 4/84)।

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী (১১৩৬-১১৯৭খ্রি.) বলেন:

> ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها فيهما.
>
> নারীদের সাক্ষ্যদানের ওপর ভিত্তি করে হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তাদের বিচারকার্য সমাধা করা জায়েয (Al-Marghīnānī, 3/106)।

কামাল ইবনুল হুমাম আল-হানাফী (১৩৮৮-১৪৫৭খ্রি.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলেন:

وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء، فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما.

হুদূদ ও মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্যসব বিচারকার্যের ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং এই দুটি ছাড়া বাকি সব বিষয়ে নারীরা বিচার করতে পারবে (Ibn Humām, 7/253)।

মুসিলী আল-হানাফী (১২০৩-১২৮৪খ্রি.) বলেন:

ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر.

যেসব বিষয়ে নারীরা সাক্ষ্য দিতে পারে সেসব বিষয়ে তাদের বিচারকার্য জায়েয। তবে তা অপছন্দনীয়। কারণ, এতে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। অথচ তাদের মৌলিক বিধান হলো পর্দা করা (Al-Mūsilī 1937, 2/84)।

ফখরুদ্দীন উসমান ইবনে আলী আয-যায়লায়ী (মৃ. ১৩৪৩ খ্রি.) বলেন:

وتقضي المرأة في غير حد وقود؛ لأن القضاء يستقي من الشهادة على ما بينا وشهادتها جائزة في غير الحدود، فكذا يجوز قضاؤها فيه، ولا يجوز في الحدود والقصاص.... وقال الشافعي: لا يجوز أن تولى القضاء لقصور عقلها قلنا: هي من أهل الولاية وبه تصير أهلا للشهادة، فكذا للقضاء كالرجل.

হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্য বিষয়ে নারী বিচার করতে পারবে; কারণ, আমাদের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিচারকার্য সাক্ষ্যদানের পর্যায়ভুক্ত এবং হুদূদ ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্যদান জায়েয। সুতরাং সেসব বিষয়ে তাদের বিচারকার্য জায়েয তবে তা হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে জায়েয হবে না। শাফেয়ী বলেন, নারীর অপরিপক্ক বুদ্ধিমত্তার কারণে তাকে বিচারক পদে নিযুক্ত করা বৈধ নয়। তার জবাবে আমরা বলি, নারী কর্তৃত্বের উপযুক্ত, এ-কারণেই সে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং বিচারকার্যেও সে পুরুষের মতোই উপযুক্ত (Al-Zaila'ī 2000, 5/106)।

চতুর্থ অভিমত

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয বলে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে। এই মত পোষণ করেছেন হানাফী মাযহাবের ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (৭৪৯-৮০৫খ্রি.), মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী (৮৩৮-৯২৩খ্রি.), হাসান আল-বসরী (৬৪২-৭২৮খ্রি.), ইবনে হাযম জাহিরী (৯৯৪-১০৬৪খ্রি.) প্রমুখ। তাছাড়া ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত হয়েছে।

মাওয়াহিবুল জালীল গ্রন্থে মালিকী মাযহাবের আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবু মারয়াম ইবনুল কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন,

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয। ইবনে যারকুন (৫০২-৫৮৬হি.) বলেছেন, আমার ধারণা, যেসব বিষয়ে নারী সাক্ষ্যদান করতে পারে, সেসব বিষয়ে তাদের বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ বলে তিনি মত দিয়েছেন। ইবনে আবদুস সালাম (১১৮১-১২৬২খ্রি.) বলেছেন, এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইবনুল কাসিমের হাসান বাসরী ও ইব্ন জারীর আত-তাবারীর অনুরূপ মত দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা উভয়ে সাধারণভাবে বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয বলে মত ব্যক্ত করেছেন (Al-Hattāb, 6/87)।

ইবনে হাজার আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন যে, মালিকী মাযহাবের একাধিক আলেম নারীর বিচারকার্যকে বৈধতা দিয়েছেন। 'কতিপয় মালিকী সাধারণভাবে এর বৈধতা দিয়েছেন' (Ibn Hajar 1407 H, 13/61)।

তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আত-তাবারী নারীর বিচারকার্যকে বৈধতা দিয়েছেন। ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে' (Al-Mubārakpūrī 1424H, 6/542)।

ইবনে হাযম আল-যাহিরী আল-মুহাল্লা গ্রন্থে বলেছেন, নারীর জন্য কর্তৃত্ব করা জায়েয আছে। এটাই ইমাম আবু হানীফার মত। বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর সম্প্রদায়ের শিফা নামের এক নারীকে বাজার দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যদি বলা হয়, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের কর্তৃত্ব কোনো নারীর কাছে ন্যস্ত করেছে, তাহলে আমরা বলবো, রাসূলুল্লাহ স. এ-কথা সাধারণ কর্তৃত্ব অর্থাৎ খিলাফতের ব্যাপারে বলেছেন। তার স্বপক্ষে প্রমাণ হলো- রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী 'নারী তার স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। মালিকী মাযহাবের আলেমগণ নারীর ওলী (অভিভাবক) ও ওয়াকীল (ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি) হওয়াকে বৈধতা দিয়েছেন। আর এ-ব্যাপারে কোনো নস (কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা) আসেনি যে, নারী কোনো বিষয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে না (Ibn hazm, 8/527-528)।

ইবন জারীর আত-তাবারী থেকে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। ইবন জুযাই (মৃ. ৭৪১ হি.) বলেছেন, আবু হানীফা সম্পদ-সংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে নারীর বিচারকার্যকে বৈধতা দিয়েছেন। তাছাড়া ইমাম তাবারী নারীর বিচারকার্যকে সাধারণভাবে বৈধতা দিয়েছেন (Ibn Juzay, 253)।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত ও তার যৌক্তিকতা

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির বিধান প্রসঙ্গে উপরিউক্ত চারটি মত ও এগুলোর সমর্থনে প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনান্তে বলা যেতে পারে, যারা নারীর বিচারকার্য পরিচালনার সামগ্রিক অধিকার স্বীকৃত হিসেবে মত দিয়েছেন তাদের বক্তব্য

অধিকতর স্পষ্ট ও সার্বিক বিবেচনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অতএব ইসলামে নারীর বিচারকার্য পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত। পেশা হিসেবে নারী বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এর পক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা যায় তা হলো:

ক. পবিত্র কুরআন বা সুন্নাহে এমন কোন নস নেই যা থেকে সরাসরি প্রমাণিত হয় যে, নারীর বিচারকার্য পরিচালনা অবৈধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে;

খ. খুলাফা রাশিদুনের যুগে নারীর ফাতওয়া প্রদান ও হিসবার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, এ দুটি বিষয় বিচারের সমজাতীয়;

গ. নারীর মেধা ও যোগ্যতার ঘাটতির বিষয়টি স্বীকৃত নয়। বরং বাস্তবে প্রমাণিত যে, এমন অনেক নারী রয়েছেন, যারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও বিচক্ষণতায় অনেক পুরুষের চেয়ে বেশি পারদর্শী। বর্তমান বিশ্বে বহু দেশে নারীরা অত্যন্ত মেধা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে নিজ দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন;

ঘ. কোন মাযহাবেই নারীর বিচারকর্ম পরিচালনা অবৈধ হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়নি। বরং প্রত্যেক মাযহাবের কেউ না কেউ এর বৈধতা দিয়েছেন;

ঙ. শাফিয়ী মাযহাবের ইমাম আজীলীর মতটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তিনি যোগ্য পুরুষের অবর্তমানে নারীর বিচারকার্য পরিচালনা বৈধ বলেছেন। বর্তমানে যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয় সেহেতু কোন নারী এ পদের জন্য মনোনীত হলে তা পুরুষের চেয়ে তার অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে বিবেচনায় বৈধ হবে;

চ. ইসলামী ফিকহের বিধি-বিধান বিধিবদ্ধের সময়ের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থায় নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিচারপদ্ধতি, আদালাত, মামলা পরিচালনা, প্রক্রিয়াসহ সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুনত্ব। বর্তমান সময়ে মানুষের সমস্যার ধরন ব্যাপৃত ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন প্রকৃতির আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফকীহগণ যেসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে নারীর বিচারকার্য পরিচালনা অবৈধ করেছেন সেসব প্রতিবন্ধকতা এখন অত্যন্ত গৌণ;

ছ. সর্বোপরি সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় রাষ্ট্র কোন নীতির প্রবর্তন করলে এবং তা শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (Rabbani 2019, 140)

এক্ষেত্রে যারা নারীর বিচারকার্য পরিচালনা অবৈধ বা সীমিত হিসেবে মত ব্যক্ত করেছেন তাদের দলীল-প্রমাণ ও যুক্তিসমূহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনান্তে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলো:

ক. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে না-জায়েয বলার জন্য যেসব আয়াতের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেগুলো দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি

যাঁরা বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁরা কুরআনের কয়েকটি আয়াতের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে এসব আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন আল্লাহর বাণী—

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একেক অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (Al-Qurān: 4:34)।

আয়াতের শানে-নুযুল ও তার প্রদত্ত অর্থের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, আয়াতটি দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক শৃঙ্খলার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আলুসী রহ. (১৮০৩-১৮৫৪খ্রি.) আয়াতটির শানে-নুযুল বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, আয়াতটি সা'দ ইবনে রবী' ও তাঁর স্ত্রী হাবিবা বিনতে যায়দের ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। হাবিবা বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে সা'দ তাঁকে চড় মারেন। ফলে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আমার কন্যা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ায় সা'দ তাকে চড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, সে সা'দ থেকে প্রতিশোধ নিক। এ-কথা শুনে হাবিবা তাঁর পিতার সঙ্গে চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, জিবরাঈল আমার কাছে এসেছিলেন, আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন.. তারপর এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। বললেন, আমরা একটি ব্যাপার চেয়েছি, আল্লাহ তাআলা অন্য ব্যাপার চেয়েছেন। আল্লাহ যা চেয়েছেন সেটাই কল্যাণকর (Al-Alūsī 1999, 4/35)।

ইবনুল আরাবী রহ. বলেছেন, হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, একজন নারী রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, আমার স্বামী আমার চেহারায় চড় মেরেছে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কিসাস বিধান কার্যকর হবে (তুমিও তাকে অনুরূপ চড় মারবে)। তখন এই আয়াত নাযিল হয়, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ 'তোমার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআনের ব্যাপারে ত্বরা করো না' (Al-Qurān: 20:114)। হাজ্জাজ একটি হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বিরতি অবলম্বন করেন, তারপর এই আয়াত নাযিল হয়, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষ নারীর কর্তা' (Ibn al-'Arabī 2003, 1/530)। এ বক্তব্য থেকে এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপর্যুক্ত আয়াতটি স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রযোজ্য। প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক নারীর কর্তা নয়, কারণ তা অসম্ভব।

ইবনে জারীর তাবারী রহ. পারিবারিক বিষয়ের ক্ষেত্রে আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেছেন, অন্য কোনো বিষয়ে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি বলেছেন, পুরুষেরা

তাদের স্ত্রীদের আদব-শিষ্টাচার শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করবে, নিজেদের জন্য ও আল্লাহর জন্য স্ত্রীদের ওপর যেসব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো পালনে তাদের সাহায্য করবে। পুরুষদের নির্দেশ তাদের স্ত্রীদের ওপর কার্যকর হবে, কারণ আল্লাহ তাদের জন্য দেনমোহর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআনে পুরুষদের যে-শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে তা তাদের দেনমোহর প্রদান ও স্ত্রীদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করার কারণে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আল্লাহ যেসব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য; যাতে স্ত্রী পরিবারের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়, স্বামীর সম্পদের হেফাজতকারী হয়। আর আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর যে-শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তার ব্যয়ভার ও জীবিকা নির্বাহে প্রচেষ্টা ব্যয় করার কারণে (al-Tabarī 1997, 2/586)।

ইমাম রাযী রহ. এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ‘যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না’ (Al-Qurān: 4:32)। তিনি বলেছেন, এই আয়াতের শানে নুযুল হলো এই যে, আল্লাহ মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষদের যে-বাড়তি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার জন্য নারীরা নানা কথা বলাবলি করছিলো। তারপর আল্লাহ উল্লেখ করলেন যে, তিনি নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এ-কারণে যে পুরুষেরা স্ত্রীদের কর্তা। তার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে অপরকে উপভোগ করে, এতে উভয়ে সমান; তা সত্ত্বেও আল্লাহ পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন দেনমোহর আদায় করার জন্য এবং স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের জন্য। এভাবে প্রত্যেকের বাড়তি অংশ অপরের বাড়তি অংশের মোকাবিলায় সাব্যস্ত হয়েছে। (অর্থাৎ, পুরুষ স্ত্রীর দেনমোহর ও ব্যয়ভার বহনের বিনিময়ে কিছু শ্রেষ্ঠত্ব পাচ্ছে, অন্যদিকে নারীরা দেনমোহর ও ভরণপোষণ প্রাপ্তির বিনিময়ে শ্রেষ্ঠত্বে ছাড় দিচ্ছে।) সুতরাং, যেন চূড়ান্তভাবেই (একের ওপর অপরের) শ্রেষ্ঠত্ব নেই (Al-Razī 1981, 9/90)। ইমাম রাযী উপভোগের যে-ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন তা দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যতীত হতে পারে না। একইভাবে পুরুষ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো দেনমোহর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করে না। সুতরাং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটা দাম্পত্য জীবনেই সীমাবদ্ধ। সংশ্লিষ্ট আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে স্পষ্টভাবে এটাই প্রতীয়মান হয়। পুরুষ পরিবারের কর্তা হিসেবে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে, বিনিময়ে সে শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য পাবে। পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই এই নিয়ম।

যাঁরা বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম বলেছেন তারা অপর যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তা হলো, أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ‘স্ত্রীলোকদের

মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে’ (Al-Qurān: 2:282)। তাঁরা যে বলেছেন নারীরা সত্য অনুধাবন করতে পারে না ও সত্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারও দলীল এই আয়াত। অথচ এই আয়াতে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ নেই; বলা যাবে না যে, যাবতীয় অবস্থাতেই নারী ভ্রান্তি ও বিস্মৃতির শিকার হবে। তাছাড়া এই আয়াতের ভ্রান্তি বা ভুলের অর্থ হলো বিস্মৃতি। এ-কথার দলীল এই আয়াত لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ‘আমার প্রতিপালক ভুল করেন না, বিস্মৃতও হন না’ (Al-Qurān: 20:52)। আল্লাহ তাআলা বিস্মৃতিকে ভ্রান্তির সমার্থবোধক প্রতিপন্ন করেছেন। সিবওয়াইহ বলেছেন, উপর্যুক্ত আয়াতে নারীদের একজনের ভ্রান্তির শিকার হওয়ার অর্থ হলো ভুলে যাওয়া (Al-Māwardī, 1/356)। ইমাম কুরতুবী বলেছেন, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির অর্থ হলো তার কোনো একটি অংশ ভুলে যাওয়া এবং কোনো একটি অংশ স্মরণ থাকা। মানুষ যে-ব্যাপারে অস্থির থাকে তাতে তার ভ্রান্তি ঘটে (Al-Qurtubī 2003; 2/300)।

নারীরা যদি ভ্রান্তি কবলিতই হতেন তাহলে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া আল্লাহর উদ্দেশে সত্যের পথ পেতেন না। অথচ তার স্বামী পুরুষ হয়েও ভ্রান্তির ওপরই ছিলো। বরং আল্লাহ তাআলা আসিয়ার ঘটনাকে যুগের পর যুগ ধরে হাজার হাজার পুরুষ মুমিনের জন্য চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তরূপে পেশ করেছেন:

> ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
>
> আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে প্রার্থনা করেছিলো, হে আমার প্রতিপালক, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার করো জালিম সম্প্রদায় থেকে (Al-Qurān: 66:11)।

নারীরা যদি সত্য দর্শনে ও সত্য অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকারই হতেন তাহলে নবী কারীম স.-এর সঙ্গে যিনি প্রথম ঈমান এনেছিলেন তিনি একজন নারী হতেন না। তিনি হলেন খাদিজা রা.। তার কারণ, ভ্রান্তি হলো হেদায়েতের বিপরীত; আলো ও অন্ধকারের মতোই। খাদিজা রা.-এর মতো আরো অনেক নারী সাহাবীই তাঁদের স্বামীদের পূর্বে হেদায়েতের পথে এগিয়ে এসেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন, হাওয়া বিনতে ইয়াযিদ আল-আনসারিয়্যাহ রা., উম্মে সুলাইম রা.।

খ. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে না-জায়েয বলার জন্য যে হাদীসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি না-জায়েয বলার ক্ষেত্রে প্রধান নির্ভরযোগ্য দলীল হলো- আবু বাকরা আস-সাকাফী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স. থেকে শ্রুত এক বাণী উষ্ট্রের যুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সময় আমার উপকার করেছে। যখন নবী করীম স.-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলো যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশা মনোনীত করেছে, তখন তিনি বললেন, কখনোই সে-জাতি সফলকাম হবে না, যারা কোনো নারীকে তাদের শাসক বানিয়েছে (Al-Bukhārī 2004, 4163)।

বিরোধী মতের অধিকারী আলেমদের পক্ষ থেকে এই দলীল বেশ সমালোচনার শিকার হয়েছে। এই দলীল-সংক্রান্ত অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করা জরুরি। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু বাকরা নাফে ইবনুল হারিস ইবনে কিলদা ইবনে আমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর একজন সাহাবী এবং সাহাবীদের মধ্যে একজন ফকীহ। মুসলিম উম্মাহ তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে একমত; যদিও মুগীরা ইবনে শু'বা রা. সংশ্লিষ্ট ঘটনায় উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর সাক্ষ্য বাতিল করেছিলেন এবং অন্য দুইজনের সঙ্গে তাঁকেও (ব্যভিচারের অপবাদের) দণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে সাক্ষ্য থেকে সরে এসে তওবা করতে বলা হলেও তিনি তা করেননি। আলেমগণ রেওয়ায়েত ও সাক্ষ্যের মধ্যকার ভিন্নতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না-হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার বর্ণিত রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর অকাট্যতা জরুরি, যেমন সাক্ষীদের সংখ্যা ও স্বাধীনতা। এ-কারণেই ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্য আলেমগণ আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন (Ibn Hajar 1407 H, 5/303)।

দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, আবু বাকরা রা. জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্র-যুদ্ধের সময়ে রাসূলুল্লাহ স. এর এ বাণী স্মরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু বাকরা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন বসরাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি,

يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة.

> একটি ধ্বংসশীল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, তারা সফল হবে না, তাদের নেতৃত্ব দেবে একজন জান্নাতী নারী।

তিনি এ হাদীসের আলোকে ফলে উষ্ট্র-যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয় (Ibn Hajar al-Askalānī 1407 H, 13/60)। কিন্তু জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহ. উপর্যুক্ত হাদীসকে বানোয়াট ও মিথ্যাচার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

مَوْضُوع: وَالْمُتَّهَم بِهِ عَبْد الْجَبَّار شيعي كَذَّاب.

> হাদীসটি জাল, এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হলো আবদুল জাব্বার; সে একজন মিথ্যাবাদী শিয়া (Al-Suyūtī 1996, 1/373)।

হাদীসটি বলার প্রেক্ষাপট এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. পারস্য সম্রাট কিসরার[৩] উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী রা. মারফত একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে চিঠিটি বাহরাইনের শাসকের কাছে পৌঁছে দিতে বলেন। তিনি তা কিসরার কাছে পৌঁছে দেবেন। কিসরা চিঠিটি পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলেন। —আমার ধারণা, ইবনুল মুসাইয়িব বলেন,—ফলে রাসূলুল্লাহ স. তাদের জন্য বদদোয়া করলেন যে, তারা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ স. জানতে পারেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যা বুরানকে[৪] তাদের সম্রাজ্ঞী নির্বাচন করেছে। তখন তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি বলেন, 'সেই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা কোনো নারীকে তাদের শাসক বানিয়েছে' (Ibn Hajar al-Askalānī 1407 H, 7/732)।

যাঁরা বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম বলেছেন তাঁরা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এ হাদীসকে শক্তিশালী দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এই হাদীসের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর চিঠি আদান-প্রদানের তারিখের সঙ্গে এই হাদীসের বক্তব্যের বিরোধ রয়েছে। প্রথমত, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ স. সপ্তম হিজরীতে পারস্য সম্রাট কিসরার উদ্দেশে চিঠি লেখেন। চিঠি পেয়ে কিসরা তাঁর ইয়ামানের কর্মকর্তা বাযানকে লেখেন, হিজাযে যে-লোকটি রয়েছে তোমার পক্ষ থেকে তার কাছে দুইজন লোক পাঠাও। ফলে বাযান নবী করীম স.-এর কাছে দুইজন লোক পাঠায় এই মর্মে যে, তোমরা তাঁকে জানিয়ে দিও, আমার প্রভু (শিরওয়াইহ) তার প্রভুকে (কিসরাকে) এই রাতে হত্যা করেছেন। এটা ছিলো সপ্তম হিজরীর ১০ই জুমাদাল উলা মঙ্গলবার রাত। ঘটনা এই যে, আল্লাহ তাআলা কিসরার পুত্র শিরওয়াইহকে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তিনি তাকে হত্যা করেন (Ibn Hajar al-Askalānī 1407 H, 7/734)।

ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত আছে যে, পুত্র শিরওয়াইহের হাতে কিসরার নিহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিলো সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল উখরা মঙ্গলবার রাত ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর (Ibn Kathīr 1986, 4/270)।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ স. রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধের পর; ইবনে হাজার আসকালানী এ-দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের বর্ণনা সঙ্কলনকারীগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. যখন

---

[৩] সাসানীয় সম্রাট দ্বিতীয় কিসরা বা দ্বিতীয় খসরু (৫৭০-৬২৮ খ্রি.)। রাজত্বকাল ৫৯০ খি.-৬২৮ খ্রি.।

[৪] বুরানদুখত: দ্বিতীয় কিসরার কন্যা (৫৯০-৬৩২)। তাঁর অপর বোন আজারমিদুখতও কিছুদিন রাজত্ব করেছেন।

তাবুকে ছিলেন তখন কায়সার ও অন্য সম্রাটদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন (Ibn Hajar al-Askalānī 1407 H, 7/734)। তিনি ইমাম তাবারানী রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি বর্ণনাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. সম্রাটদের কাছে যাঁদের চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সবাই (আমর ইবনুল আস ব্যতীত) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ স. তাঁর প্রতিনিধিদের তাঁর মৃত্যুর খুব বেশি পূর্বে প্রেরণ করেননি।

সুহাইলী বলেছেন, কিসরার মৃত্যু ঘটেছিলো নবম হিজরীর জুমাদাল উলার ১০ তারিখ মঙ্গলবার রাতে (Ibn Kathīr 1986, 2/180)। ইবনুল আছীর তাবুক যুদ্ধের ঘটনাবলি নবম হিজরীতে ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন (Ibn al-Asīr 1997, 2/276)।

ইবনে কাছীর ত্রয়োদশ হিজরীর ঘটনাবলিতে যা উল্লেখ করেছেন তা এ ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী দলীল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেছেন, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাট ও তার পুত্র নিহত হওয়ার পর শাহরিয়ার ইবনে আরদাশির ইবনে শাহরিয়ারকে বাদশাহ মনোনীত করার ব্যাপারে একমত হয়। তারা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অনুপস্থিতির সুযোগ নেয়। .. শাহরিয়ার আমীরুল মুসলিম মুসান্না ইবনে হারিসা কর্তৃক নিহত হন। পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটকে নিহত হতে দেখে কিসরার কন্যা বুরান বিনতে আবারবিযাকে তাদের সম্রাজ্ঞী মনোনীত করে। তিনি ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বুরান এক বছর সাত মাস রাজত্ব করেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেন (Ibn Kathīr 1986, 7/17)। এসব ঘটনা রাসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যুর পর ঘটেছে, তাঁর জীবদ্দশায় নয়।

রাসূলুল্লাহ স. কিসরার কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন নবম হিজরীতে। কিসরার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিরওয়াইহ সম্রাট হন। ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। তারপর তাঁর পুত্র আযদাশির ইবনে শিরওয়াইহ সম্রাট হন। তিনি দেড় বছরের মতো রাজত্ব করেন। শাহরিয়ার আযদাশিরের বিরুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। শাহরিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি মুসান্না ইবনে হারিসা কর্তৃক নিহত হন। তারপর পারস্যবাসী কিসরার কন্যা বুরানকে তাদের সম্রাজ্ঞী মনোনীত করে। তাহলে রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কীভাবে এই সংবাদ পৌঁছালো যে পারস্যবাসীরা তাদের একজন নারীকে শাসক মনোনীত করেছেন? উপযুর্ক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স. বুরানের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ব্যাপারটি শোনেননি।

সুতরাং সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ‘সেই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা কোনো নারীকে তাদের শাসক মনোনীত করে’-এর ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই যে, রাসূলুল্লাহ স. ওহীর মাধ্যমে ঘটনাটির ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং এ-কথা

বলেছিলেন। যেমন উষ্ট্র যুদ্ধ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। অনেক আলিমই মনে করেন যে, হাদীস দুটিই ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-এর আগাম সতর্ক বাণী। এ হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে নারীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করা কিংবা হারাম করা নয়।

গ. বিচারক পদে নারীর নিয়ুক্তি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি

মান্য ও গ্রহণযোগ্য আলিমদের একটি অংশ বিচারক পদে নারীর নিয়ুক্তিকে হারাম বলেননি। বরং প্রতিটি প্রসিদ্ধ মাযহাবের কেউ না কেউ এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইবনে রুশ্দ (১১২৬-১১৯৮খ্রি.) ইজমার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, বিচারক পুরুষ হওয়া শর্ত কি-না সে-ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর বলেছেন, রায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, অর্থ-সম্পদ-সংক্রান্ত মামলায় নারীর বিচারক হওয়া বৈধ। ইবনে জারির আত-তাবারী বলেছেন, সাধারণভাবে সব বিষয়ে নারীর বিচারক হওয়া বৈধ (Ibn Rushd 1995, 4/291)। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, বিচারক পদে নারীর নিয়ুক্তি জায়েয নয় বলে যাঁরা মত দিয়েছেন তাঁরা আবু বাকরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। এটা জমহুরের বক্তব্য। ইবনে জারির আত-তাবারী ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি যেসব ব্যাপারে নারীরা সাক্ষ্য দিতে পারে সেসব ক্ষেত্রে বিচারকার্য সমাধা করতে পারবে বলে মত দিয়েছেন। মালিকী মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম সাধারণভাবে নারীর বিচারকার্যের বৈধতা দিয়েছেন (al-Askalānī 1407 H, 13/61)।

এ-ব্যাপারে যদি ইজমাই প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে এ ব্যাপারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য আলেমদের মধ্যে মতভেদ থাকতো না। তাঁদের বিশ্বস্ততা ও সততা এতটা প্রসিদ্ধ যে, তাদের মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটি প্রায় অসম্ভব। এ-কথাও বলা যাবে না যে, ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, তবে ইবন জারীর ও অন্যদের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। কারণ, ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সকল আহলে ইলমের ঐকমত্য জরুরি। যেমন শাওকানি (১৭৫৯-১৮৩৪খ্রি.) বলেছেন, কোনো মুজতাহিদ যদি ইজমাপন্থীদের সঙ্গে মতবিরোধ করেন তবে জমহুরদের কোনো ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলো না এবং এই ইজমা কোনো দলীলও নয়। সায়রাফি বলেছেন, এটাকে শায বা ব্যতিক্রম বলার কোনো সুযোগ নেই (Al-Shawkānī 1997, 160)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইজমার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে-ব্যক্তি ইজমার দাবি করবে সে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলো। কারণ, মানুষ সাধারণত ঐ বিষয়ে ইখতিলাফ করে থাকে, যা তার জানা থাকে না (al-Jawjiyyah 1991, 1/30)।

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে যাঁরা হারাম বলেছেন তাঁরা কোনো যুগেই নারীকে রাষ্ট্রীয় সাধারণ পদে নিযুক্ত করা হয়নি এবং এতে কার্যকর ('আমলী) ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাঁরা যদি কোনো যুগ বলে সর্ব যুগ বুঝিয়ে থাকেন তাহলে তা সত্যের বরখেলাফ হবে। কারণ, ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, বিভিন্ন যুগে বহু নারী রাষ্ট্রের সাধারণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন সাবার রাণী বিলকিস। তাঁর কথা কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছাড়াও আরো অনেকে রয়েছেন। আর যদি বোঝাতে চান যে, রাসূলুল্লাহ স. কোনো নারীকে রাষ্ট্রের কোনো সাধারণ পদে নিযুক্ত করেননি, তাহলে তা ঠিক আছে। এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। জাহেলি যুগে ও ইসলামের শুরুর দিকে নারীদের বিচারকার্য সমাধা না-করার ব্যাপারটিতে বড় ধরনের প্রথাগত প্রভাব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. নিজেই তাঁর সময়ে বিচারের যাবতীয় কার্য সমাধা করেছেন; নারী-পুরুষদের কাউকে, এমনকি বড় সাহাবীদের কাউকেও বিচারক পদে নিযুক্ত করেননি। ইসলামী রাজ্য বিস্তৃত হলে তিনি তাঁর প্রশাসকদের প্রেরণ করেছেন, যাঁরা সরাসরি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর এ-ধরনের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের কোনো দখল নেই। তারপরও এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. কিছু নারীকে কতিপয় দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন সামরা বিনতে নুহাইক আল-আসাদিয়্যাহ রাসূলুল্লাহ স.-কে পেয়েছিলেন এবং বেঁচেছিলেন। তিনি বাজারে আনাগোনা করতেন, ভালো কাজের নির্দেশ দিতেন, খারাপ কাজে নিষেধ করতেন। তাঁর সঙ্গে একটা চাবুক থাকতো। কেউ খারাপ কাজ করলে তিনি ওই চাবুক দ্বারা পেটাতেন (Ibn 'Abd al-Barr 2002, 4/419)।

তারা মনে করেন, রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি পরিত্যাগ করার বিষয়টি এ-ব্যাপারে একটি দলীল। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, সুন্নাহ তা-ই যা রাসূলুল্লাহ স. থেকে কথা, কর্ম ও অনুমোদনের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। যেমন সুন্নাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল-আমিদী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর বক্তব্যসমূহ, কর্মসমূহ ও অনুমোদনসমূহ সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত (Al-Aāmidī, 1/145)। তাছাড়া কোনো কাজ বা বিষয় পরিত্যাগ করা, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে দলীল হতে পারে না। যেমন ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. বলেছেন,

> السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع : فغلط، وتغليط للصحابة ... وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة ، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له ...

> প্রকৃত রাষ্ট্রশাসন সেটাই, যাতে মানুষ কল্যাণের অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে থাকে এবং অনিষ্ট ও অনাচার থেকে দূরে থাকে, যদিও রাসূলুল্লাহ স. তা প্রণয়ন করে যাননি এবং এ-ব্যাপারে ওহী নাযিল হয়নি। তুমি যদি বলো, তা শরীয়া মোতাবেক হতে হবে, অর্থাৎ শরীয়া যে-নির্দেশনা দিয়েছে সেই অনুযায়ী হতে হবে, তাহলে তোমার কথা ঠিক আছে। আর যদি বলো, যে-ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য নেই তা দিয়ে রাষ্ট্রশাসন হবে না, তাহলে তোমার কথা ভুল এবং সাহাবীদেরও ভুল প্রতিপন্ন করা হয় ... এটা এমন অবস্থান, যেখান থেকে অনেকের পদস্খলন ঘটে এবং অনেকে ভ্রান্তির শিকার হয়। তারা শরীয়াকে এমন একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে, যা মানুষের প্রয়োজনীয় কল্যাণ সাধনে সক্রিয় নয়। সত্য অনুধাবন ও সত্য বাস্তবায়নের অনেক পন্থা তারা নিজেদের জন্য রুদ্ধ করে ফেলে... (al-Jawjiyyah, 13)।

ঘ. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম বলার ক্ষেত্রে কিয়াসী (তুলনাভিত্তিক) দলীলসমূহের ব্যাপারে আপত্তি

আলেমগণ বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির বিধানকে সমপর্যায়ের কয়েকটি বিষয়ের বিধানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা একে ইমামতে উযমা বা মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় খিলাফতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন— لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 'কখনোই সে-জাতি সফলকাম হবে না যারা কোনো নারীকে তাদের শাসক বানিয়েছে' (Al-Bukhārī 2004, 4163)। তাঁদের বক্তব্য থেকেও তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন খাত্তাবি (৯৩১-৯৮৮খ্রি.) বলেছেন, নারী শাসক হতে পারবে না, বিচারকও হতে পারবে না (al-Askalānī 1407 H, 8/128)। নারীরা মুসলিম উম্মাহর খলীফা হতে পারবে না, সুতরাং তারা বিচারকও হতে পারবে না। এখানে বিচারকার্যকে সাধারণ কর্তৃত্বের (খিলাফত ও শাসনের) সঙ্গে তুলনা করেছেন অথবা মূলকে (রাষ্ট্রশাসন) তার শাখার (বিচার) সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কিন্তু এ-ধরনের তুলনার জন্য খেলাফত ও বিচারের মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য জরুরি। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তিনটি বিষয় জরুরি : ১. রায় বাধ্যতামূলক করার কর্তৃত্ব; ২. ইনসাফ ও শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং ৩. সাধারণ আবর্তিত বিষয়ে শরয়ী হুকুম বিশ্লেষণের জ্ঞান। এসবের জন্য দুই ধরনের সক্ষমতা জরুরি: ১. নির্বাহী সক্ষমতা ও ২. বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা। অন্যদিকে খিলাফতে উযমা বা মুসলিম উম্মাহর খিলাফত বলতে কী বোঝায় তা আল-মাওয়ারদি কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়, ইমামত

(রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব) হলো দীনের সুরক্ষা ও বিশ্ব পরিচালনায় নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব (Al-Māwardī 1996, 15)। ইবনে আবিদিন (১৭৮৪-১৮৩৬খ্রি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে খিলাফতের অর্থ হলো দীনের ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নেতৃত্ব (Ibn ʻAbidīn 1992, 1/548)। সুতরাং ইমামতে উযমা বা রাষ্ট্রশাসনের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে নেতৃত্ব ও দীনি খেলাফতের ওপর। এর প্রথমটি কর্তৃত্ব, বাধ্যতামূলককরণের ক্ষমতা, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কতা ও দেশকে সুরক্ষাদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে এবং দ্বিতীয়টি শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ ও ইনসাফ-সম্পর্কিত শরয়ী জ্ঞান, ইজতিহাদ (গবেষণা), নামায প্রতিষ্ঠা করা, ফতোয়া জারি করা ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ইমামতে উযমা বিচারকার্যের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক, অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, প্রত্যেক খলীফাই কাজী, কিন্তু প্রত্যেক কাজীই খলীফা নয়। এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা সেই যুগেই গ্রহণযোগ্যতা পেতো, যখন স্বয়ং বিচারককে রায় বাস্তবায়ন করতে হতো। এর জন্য শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন পড়তো। এ-জন্য পুরুষ বিচারক নিযুক্ত করা হতো। কারণ, নারীদের এ-ধরনের শারীরিক সক্ষমতা নেই।

কিন্তু বর্তমান সময়ে বিচারকার্য সম্পূর্ণ জ্ঞানগত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, তা হলো শরয়ী আহকাম, বিদ্যমান আইন ও ইনসাফ সম্পর্কে জানা। এটা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, শারীরিক শক্তিমত্তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। রায় বাস্তবায়নে শারীরিক শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিচারক এখন মুক্ত। এখন শাসক থেকে বিচারক সবার দায়-দায়িত্ব বণ্টিত হয়ে গেছে; কেউ গুচ্ছ আকারের দায়িত্ব পালন করেন না। রাষ্ট্রপ্রধানও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন না, ফতোয়া জারি করেন না, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিচার-মীমাংসা করেন না। রাষ্ট্রীয় পদসমূহের প্রত্যেকটির দায়িত্ব স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বিচারকের কাজকে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যাবলির সঙ্গে তুলনা করা একটি জটিল ও অসম্ভব ব্যাপার, যা বোধগম্য নয়। সুতরাং এটা বলাও অসম্ভব যে, বিচারক পদে নিযুক্তির বিষয়টিকে সাধারণ কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্বের সাথে তুলনা করা যায়।

ঙ. বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি হারাম বলার ক্ষেত্রে যুগের প্রভাব

পূর্ববর্তী মনীষীগণের কিতাবসমূহ পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি হারাম বলার ক্ষেত্রে কালগত প্রভাব রয়েছে। কারণ, পুরুষেরাই বিচারক পদে আসীন হতো। ফলে সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে, নারীরা বিচারক পদে নিযুক্ত হতে পারে না। প্রথাগত কারণেই নারীর বিচারক পদে নিযুক্তির বিষয়টি স্বীকৃত ছিলো না। ফলে এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর তাফসির করা হয়েছে উপর্যুক্ত খবরে ওয়াহিদ তথা একক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের ওপর একান্ত নির্ভরশীল থেকে। তদুপরি উক্ত হাদীসে বর্ণিত ‘নারী’ শব্দটি যেমন ব্যাপকতাজ্ঞাপক হবার সম্ভাবনা

রাখে, তেমনি ব্যাপকতাজ্ঞাপক না হবারও সম্ভাবনা রাখে। বস্তুত এমতাবস্থায় তা দ্বারা কেবল বুরানই উদ্দেশ্য হবে। অপরদিকে ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, বুরান তাঁর পূর্বের বহু পুরুষ শাসকের চেয়েও ভালো ছিলেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সমসাময়িক পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় কিসরা ছিলেন অত্যাচারী ও অহংকারী। তিনি ৩৫ হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর ছেলে শিরওয়াইহের চরিত্রও ছিলো খারাপ। অন্যদিকে বুরানদুখত ছিলেন সৎ চরিত্রের এবং প্রজাদের প্রতি কোমলহৃদয়। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা ও ইনসাফ ফিরিয়ে এনেছিলেন। ইবনে জারির আত-তাবারী রহ. বুরান সম্পর্কে বলেছেন, বুরান যেদিন শাসক হন সেদিন বলেছেন, আমি সততার সঙ্গে কার্য সমাধা করবো এবং ইনসাফের নির্দেশ দেবো। তিনি তা-ই করেছিলেন। .. তিনি সবাইকে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সবাইকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন (al-Tabarī 1979, 2/168)।

আল্লাহ তাআলা সাবার রাণী বিলকিসের রাজ্যের প্রশংসা করেছেন। সেই রাজ্যের শৃঙ্খলা, দাপট ও শক্তিমত্তার উল্লেখ করেছেন। সাবার রাণী তাঁর রাজ্যে কল্যাণশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সবাই তাঁর অনুগত ছিলো।

একইভাবে শাজারা আদ-দুর তাঁর স্বামী মিসরের সুলতান সালিহ আইয়ুবের মৃত্যুর পর রাজ্যের হাল ধরেছিলেন এবং ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করেছিলেন এবং তিনমাস মিসর শাসন করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য, তিনি ক্রুসেডার শত্রুদের প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। এসকল নারী শাসক কি রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন? না, তারা বরং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন, শত্রুদের প্রতিহত করেছিলেন, রাজ্যকে সংহত অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন (Hilal 2011, 105-118)।

কারা বেশি নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করে—নারীরা না পুরুষরা? এই প্রশ্নের জবাবের জন্য কুরআনের একটি আয়াতই যথেষ্ট—

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً

> ‘সে (রানি বিলকিস) বললো, রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং ওখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে’ (Al-Qurān, 27/34)।

উপসংহার

কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। এ-কারণেই নবী-রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছে। এটি আল্লাহরও একটি সিফাত। ইনসাফ চাওয়া ও এ-ব্যাপারে সচেতন থাকা নারী-পুরুষ

উভয়ের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল-কাযা বা বিচারের ধারণার ক্ষেত্রে আলেমগণের বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনা থেকে তিনটি মৌলিক দিক উন্মোচিত হলো, ১. কর্তৃত্ব, যার জন্য স্বাধীনতা ও বাধ্যতামূলককরণের ক্ষমতা জরুরি; ২. ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এর জন্য শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি; ৩. শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা, এর জন্য শরয়ী জ্ঞান ও বিচারকার্যের জন্য জরুরি অন্যান্য জ্ঞান থাকা জরুরি। নিরবচ্ছিন্ন ইসলামী শাসনামলের বিচারব্যবস্থার যে-বিকাশ ও উৎকর্ষ তার পর্যালোচনা থেকে বোঝা গেছে যে, তখন বিচারকার্য দুটি মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো : ১. ন্যায়বিচার ও ইনসাফ-সম্পর্কিত জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা এবং ২. রায় বাস্তবায়নে বাধ্য করার ক্ষমতা বা শারীরিক সক্ষমতা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের ফলে এই দুই ধরনের সক্ষমতা একটি সক্ষমতার রূপ নিয়েছে, তা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও ইনসাফ-সম্পর্কিত জ্ঞান। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে আলাদা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এ কারণে ইসলাম শরীয়তের সীমারেখায় থেকে প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই নারী-পুরুষ উভয়কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে বিচার কাজে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। এমনকি তা হারাম সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ও অকাট্য দলীল প্রমাণ নেই। তথাপি যেহেতু বিষয়টি সর্বসম্মত নয়, তাই এ বিষয়ে স্থান-কাল-পাত্র-প্রথা ও সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত নিলে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Ya‘lā al-Farrā, Muhamad ibn al-Hussaīn. 1983. *Al-Ahkām al-Sulāniyya*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Aāmidī, Saif al-Dīn Abū al-Hasan ‘Alī ibn Abū ‘Alī ibn Muhammad. *Al-Ihkām fī Usūl al-*

Ahkām. Egypt: Maktaba Sabīh.

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Mahmūd ibn ‘Abdullah al-Husainī al-Baghdādī. 1997. *Rūh al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qurān al-‘Adhīm wa al-Sab‘a al-Mathānī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Ansārī al-Shāfi‘i, Abū Yahyā Zakariyā ibn Muhammad. 2001. *Asnā al-Matālib Sharh Rawd al-Tālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bahūtī al-Hambalī, Mansūr ibn Yūnus. 2003. *Al-Rawd al-Murabba‘ bi-Sharh Jād al-Mustanqa‘*. Beirut: Alam al-Kutub.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammd ibn Ismā‘īl. 2004. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn al-Haitham.

Al-Gazhnawī, Jamāl al-Dīn Ahmad ibn Mahmūd ibn Sa‘id al-Qābisī. 2011. *Al-Hāwī al-Qudsī fī Furū‘ al-Fiqh al-Hanafī*. Syria: Dār al-Nawādir.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. 1997. *Al-Wasīth fī al-Mazhab*. Egypt: Dār al-Salām.

Al-Hattāb al-Mālikī, Shams al-Dīn Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān. 1992. *Mawāhib al-Jalīl fī Mukhtasar Khalīk*. Bairut: Dār al-fikr.

Al-Jailayī al-Hanafī, Fakhr al-Dīn ‘Usmān ibn ‘Alī. 2000. *Tabyīn al-Haqāyiq Sharh Kanj al-Dakāyiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jawharī, Ismā‘īl ibn Hammād. 1982. *Al-Sihāh Taj al-Lugah wa Sihāh al-Arabiyyah.* Egypt: Dār al-Ilm al-Malayīn.

Al-Kāsānī Al-Hanafi, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Ahmad. 2000. *Badāi‘ al-Sanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Khurashī, Muhammad ibn ‘Abdullāh ibn ‘Alī.1997. *Hāshiyah Al-Khurashī Alā Mukhtasar Khalīl.* Beirut: Matbaa‘ Muhammad ‘Alī Baidūn.

Al-Maqdisī al-Hambalī, Bāhā al-Dīn ‘Abd al-Rahmān.1990. *Al-‘Uddah Sharh al-Umdah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ‘Ali ibn Abu Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad ibn Habīb. 1996. *Al-Ahkām al-Sultāniyya*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.

—. *Al-Nukat wa-al-‘Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Maydānī, ‘Abd al-Ghanī al-Ghunaymī. *Al-Lubāb fī Sharh al-Kitāb Sharh li-Mukhtasar al-Qudūrī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mīsābī, Muhammad al-Tāhir. 1998. *Al-Tāhir Ibn Ashūr wa Kitābuhū Maqāsid al-Sharīya al-Islāmiyyah*. Malaysia: Al-Basāyir li al-Intāj al-‘Ilmiyyah.

Al-Mirdābī al-Sa‘dī al-Hambalī, Alā al-Dīn Abū al-Hasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad.1997. *Al-Insāf fī Ma‘rifa al-Rajih min al-Khilāf.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mubārakpūrī, Muhammad ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahīm. 1424H. *Tuhfat al-Ahwadhī bi-Sharh Jami’ al-Tirmīdhī*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mūsilī al-Hanafī, Majd al-Dīn Abū al-Fadl Abdullah ibn Mahmūd ibn Maudūd. 1937. *Al-Iktiyār li-Ta‘līl al-Mukhtār*. Cairo: Matbaa‘ al-Halabī.

Al-Qurtubī, Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansārī. 2003. *Al-Jāmi‘ li-Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 2004. *Tārīkh al-Khulafā*. Saudi Arabia: Maktaba al-Bāj, Macca.

—1996. *Al-Laāliu al-Masnūah fī al-Ahādīs al-Mawdhūah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Razī, Fakhr al-Dīn Muhammad. 1981. *Al-Tafsīr al-Kabīr / Mafātīh al-Gayīb*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Shawkānī, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad. 1997. *Irshād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-‘Ujailī, Sulaymān ibn ‘Umar Ibn Mansūr. 1996. *Hāshiyat al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Rabbani, Md. Ruhul Amin. 2019. “Islame Narir Bichar Karjo Porichalonar Odhikar”. *Conference Proceedings : Women Rights in Islam*, Aliah University, Kolkata, India, PP 124-141.

Hasan, Hasan Ibrāhīm. 1979. *Tārīkh al-Islām al-Siyāsī wa al-Dīnī wa al-Saqāfī wa al-Iztimāyī*. Cairo: Maktaba al-Nahda al-Misriyyah.

Ibn ‘Abd al-Barr, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdullh ibn Muhammad. 2002. *Al-Istī‘āb fi Ma‘rifat al-Ashāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn ‘Abidīn, Muhammad Amin ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Hanafī. 1992. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn al-‘Arabī, Muhyī al-Dīn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn al-‘Arabī al-Ḥātimī al-Ṭā’ī. 2003. Ahkām al-Qurān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn al-Asīr, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Abū al-Karam Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Karīm. 1997. *Al-Kāmil fī al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

Ibn Hajar al-Askalānī, Abū al-Fadl Ahmad ibn Alī ibn Haja. 1407 H. *Fath al-Bārī Sharh Sahīh al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-Matba al-Salafiyya.

Ibn Hajar Al-Haithamī, Shihāb al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad. 2001. *Tuhfah al-Muhtāj bi-Sharh al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Hazm al-Zāhirī, Abū Muhammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd Ibn Hazm. *Al-Muhallā bi-al-Athār.* Bairut: Dār al-fikr.

Hilal, Huda Mohammad Hassan. 2011. "Qira't Tahliliyyah Naqdiyyah Fi Tawalla al-Marat Mansab al-Qada". Islamiyyah al-Marifa : Majallah al-Fikr al-Islami al-Muasir. Vol 64. (89-120)

Ibn Hishām, Abū Muhammad 'Abd al-Malik. 1998. *Al-Sīrah al-Nawawiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid ibn 'Abd al-Hamīd. *Fath al-Qadīr.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Jarīr al-Tabarī, Abū Ja'far Muḥammad. 1997. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil ay al-Qurān*. Damascus: Dār al-Qalam.

—1979. *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Juzayy, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Juzayy al-Kalbī al-Gharnātī. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyya*. Beirut: Dār al-fikr.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kahīr. 1986. *Al-Bidāya wa al-Nihāya*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Qayyim al-Jawjiyyah, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Abū Bakr. 1991. *'Ilām al-Muwaqiyīn 'an Rabb al-Alamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

—*Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

—1986. *Jād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Ibād*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad. 1992. *Al-Mughni*. Cairo: Hajar.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm. 2004. *Al-Hisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār Ibn Hazm.

—1995. *Majmū'u Fatāwā Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Saudi Arabia: Majma'u al-Malik Fahd.

'Illlish, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Mālikī. 2003. *Sharh al-Manh al-Jalīl Alā Mukhtasar Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.